Jagannath University Journal of Arts, Vol. 9, No. 2, July–December 2019
ISSN 2519-5816

১৯৭১ এর গণহত্যা ও নির্যাতন: প্রসঙ্গ নোয়াখালী জেলা

শামছুল কবির*

Abstract: The liberation war in 1971 is the most remarkable event in the history of Bangladesh after the partition of Indian subcontinent Pakistan was formed for the Muslims. Pakistan had two parts: East and West. Eastern part was mainly the province of Bengal. However due to discrimination in economy and ruling powers against them, the East Pakistanis vigorously protested and declared independence on March 26, 1971 under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman. The Pakistani government sent troops to East Pakistan. They began a military crackdown on the Eastern wing. During the nine month war of freedom whole eastern part of Pakistan was turned into a inexpressible masskilling and operations. Noakhali was not dropout from these massacres and oppressions. The Pakistanis armies and their associates occured a lot of incidents at Noakhali like massacres, rapes, abductions and forced conversions of Hindus and loot and arson of Hindu properties, perpetrated by the Muslim community in the districts of Noakhali. They also started killing the people, burnt houses, looted valuables and raped women in Noakhali. This paper attempts to mention the genocides and oppressions in 1971 emphasising Noakhali district.

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের নানাবিধ বৈষম্য দেখা দেয়। পাকিস্তানের বেশিরভাগ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু পাকিস্তান সরকার জোরপূর্বক ঘোষণা করে যে পাকিস্তানের ভাষা হবে উর্দু; ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতি তা কোনভাবে মেনে নিতে পারেনি। শুরু হয় বাংলা ভাষার দাবিতে ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন আরও তিব্রতর হয়; এতে অনেক ভাষা সৈনিক শহীদ হন। বাঙালি জাতি বিভিন্ন অধিকার আদায়ে শুরু করে আন্দোলন সংগ্রাম। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাঙালি জাতি সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করার পরও পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে। ফলে বাঙালি জাতি অধিকার আদায় ও পরাধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক জনসভায় মুক্তিযুদ্ধের ডাক দেন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী এ দেশে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হয় এবং তা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি আজও খুবই গুরুত্ব বহন করে আছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এগারটি সেক্টরের মধ্যে নোয়াখালী জেলা ২ নং সেক্টরের

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

অধীনে ছিল। এই মহান যুদ্ধে অন্যান্য জেলাগুলোর ন্যায় নোয়াখালী জেলার রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। নোয়াখালী জেলা কুমিল্লা সেনানিবাস সংলগ্ন হওয়ায় পাকিস্তানি সেনা এবং তাদের সহযোগীদের (রাজাকার, আলবদর, আলশামস ইত্যাদি) মোকাবেলা করা মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে প্রথম দিকে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। কারণ যুদ্ধ আরম্ভের প্রাক্কালে বাঙালিরা ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। তারপরও এ অঞ্চলের মুক্তিকামী বাঙালি জাতির ঐক্য, সাহস, মনোবল ও জাতীয়তাবোধের চেতনা তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে মুক্তির উন্মাদনায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু পাকবাহিনী ও স্বাধীনতা বিরোধী গোষ্ঠীর সদস্যরা সুসজ্জিত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাঙালি জাতিকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং তারা মুক্তকামী জনগণ ও সাধারণ-নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার এবং গণহত্যা চালায়; এমনকি অনেকের ঘর-বাড়িতে অগ্নিকান্ড ঘটায় ও অনেক নারী-পুরুষ নির্যাতনের শিকার হয়। ফলে মুক্তিযুদ্ধের সময় নোয়াখালী জেলায় যেসব বর্বরোচিত গণহত্যা ও নির্যাতন হয়েছিল তা প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক এবং ক্ষেত্রজরিপ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে উক্ত প্রবন্ধে আলোচনার প্রয়াস পাব।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাকর্মটি সম্পন্নকরণের ক্ষেত্রে প্রধানত দুইটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন- ১. ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং ২. ক্ষেত্র জরিপ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।

১. ঐতিহাসিক পদ্ধতিঃ ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থাদি, পত্র-পত্রিকা, ব্যক্তিগত ডায়েরি, চিঠিপত্র, সরকারি দলিলপত্র, গবেষণা অভিসন্দর্ভ ইত্যাদি পঠন পাঠনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনাপূর্বক গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হবে।

২. ক্ষেত্র জরিপ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি : এই পদ্ধতির মাধ্যমে নোয়াখালী জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা, সহযোদ্ধা, সহকর্মী, সহযোগী, প্রত্যক্ষদর্শী ও জনসাধারণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্থান, গণকবর, সমাধি, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি স্থান ও স্থাপনা অনুসন্ধান, সরেজমিনে জরিপ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সতর্কতার সাথে গ্রহণ করে গবেষণা কর্মে উপস্থাপিত হবে।

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী, রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও অন্যান্য স্বাধীনতাবিরোধীরা নোয়াখালী জেলায় যেসকল গণহত্যা, অত্যাচার, নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগ করেছিল তার প্রামাণ্য চিত্র অনুসন্ধান ও উপস্থাপন, যুদ্ধক্ষেত্র, বধ্যভূমি এবং গণকবরের স্থান চিহ্নিতকরণ, হতাহতের ঘটনা নিরূপন, অত্যাচার ও নির্যাতনের সংখ্যা নির্ণয় এবং গণহত্যার স্থান চিহ্নিতকরণসহ প্রভৃতি ঘটনাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে সঠিক তথ্য উদঘাটন করা; এমনকি বস্তুনিষ্ঠভাবে সঠিক, তথ্যবহুল, নির্ভুল ও অবিকৃত ইতিহাস নব প্রজন্মের নিকট তুলে ধরাই আলোচ্য গবেষণার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় গণহত্যা ও নির্যাতন প্রসঙ্গটি উন্মোচিত হলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গতা পাবে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী জেলার মুক্তিকামী জনগণ বিরাট অবদান রেখেছিল। তাদের ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়। অত্র জেলার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিছু অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হলেও মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া গণহত্যা, অত্যাচার, নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি বিষয়াবলি নিয়ে

তেমন কোন তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ রচিত হয়নি। যদিও ইতিপূর্বে নোয়াখালী জেলার মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য ঘটনাবলি নিয়ে গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাতে কিছুটা তথ্যবিভ্রাট ও ইতিহাস বিকৃতির ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। ফলে আলোচ্য গবেষণায় নোয়াখালী জেলার মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া সংঘাত, সংঘর্ষ, গণহত্যা ও হতাহতের বিবরণসহ প্রভৃতি বিষয় ও ঘটনাবলি পঠন-পাঠনের মাধ্যমে যথাসম্ভব নির্ভুল, সঠিক, তথ্যবহুল, তথ্যনির্ভর ও পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপন করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কাজেই ইতিহাস বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা ও সঠিক ইতিহাস রচনাসহ মুক্তিযুদ্ধকালীন অত্র অঞ্চলের গণহত্যা ও অন্যান্য ঘটনাবলি জানার জন্য বর্তমানে গবেষণার যৌক্তিকতা রয়েছে। সর্বোপরি বিভ্রান্তিকর ও বিকৃত ইতিহাস জানা থেকে নব প্রজন্মকে রক্ষা করাসহ সঠিক ও নির্ভুল ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

নোয়াখালী জেলার ভৌগোলিক পরিচয়

নোয়াখালী জেলা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা হিসেবে খুবই পরিচিত। ভুলুয়া জেলা প্রতিষ্ঠার প্রায় ৪৭ বছর পর ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সরাসরি এ অঞ্চলের নামকরণ করা হয় নোয়াখালী।[১] ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালী কুমিল্লা জেলার কয়টি পরগণা নিয়ে স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা লাভ করে।[২] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে নোয়াখালী জেলা পূর্ব পাকিস্তানের অধীনে থাকে।[৩] ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় নোয়াখালী জেলা ২নং সেক্টরের অধীনে ছিল। নোয়াখালী জেলা অনেক বড় ও বিস্তৃত ছিল বিধায় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় ১৩ বছর পর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে নোয়াখালী জেলাকে তিনটি জেলায় রূপান্তরিত করে। যেমন- ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা।[৪] বর্তমানে নোয়াখালী জেলাটি দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। নোয়াখালীর জেলার আয়তন ৩৬০০.৯৯ বর্গ কি.মি.।[৫] জেলাটি ২২°-০৭′ উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৩°.০৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°.৫৩′ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯০°.২৭′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত।[৬] নোয়াখালী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও ভোলা, দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা, পূর্ব-উত্তরে ত্রিপুরা ও কুমিল্লা এবং উত্তর-পশ্চিমে চাঁদপুর ও মেঘনা নদী অবস্থিত।[৭] মেঘনা নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ায় নোয়াখালী জেলার আয়তন সর্বদা পরিবর্তনশীল। ভাঙা গড়ার বিচিত্র লীলাভূমি হলো নোয়াখালী জেলা। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে নোয়াখালী জেলা খুবই পরিচিত।

সংগৃহীত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সতর্কতার সাথে গ্রহণ করে নোয়াখালী জেলার গণহত্যা, নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাবলির তথ্যভিত্তিক বিবরণ এই প্রবন্ধে যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

ফেনাঘাটার গণহত্যা (২৪ এপ্রিল ১৯৭১)

নোয়াখালী জেলার সদর উপজেলা থেকে উত্তরে দুই কিলোমিটার দূরত্বে ফেনাঘাটা অবস্থিত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল পাকহানাদার বাহিনী দুইভাগে বিভক্ত হয়ে একটি গ্রুপ লক্ষ্মীপুর অভিমুখে এবং আরেকটি গ্রুপ মাইজদীতে অপারেশন করে। মাইজদী গ্রুপটি মাইজদী কোর্ট স্টেশন এবং ম্যালেটারি অফিস ঘেরাও করে প্রায় ১৬০ জন লোককে গ্রেফতার করে চৌমুহনী টেকনিক্যালে নিয়ে যায়। সকলের সামনে কাদির হানিফ তাজুকে প্রকাশ্যে প্রথমে বেয়োনেট চার্জ ও পরে গুলি করে হত্যা করে। এসময় টেকনিক্যাল স্কুলের বারান্দায় নোয়াখালীর তৎকালীন ডি.সি. মঞ্জুর করিমকে উপস্থিত করে নাজেহাল করা হয়।[৮] একই দিনে পাকহানাদার বাহিনীর আরেকটি

দল টেকনিক্যাল থেকে লক্ষ্মীপুরের দিকে রওয়ানা হয়। পাকসেনারা একটি লাল জিপ সামনে রেখে অগ্রসর হয়ে ফেনাঘাটের পশ্চিমে জয়নারায়নপুর সাঁকোর নিকটে পৌঁছা মাত্রই সুবেদার লুৎফর রহমানের প্রেরিত গ্রুপ কমান্ডার শফিউল্লাহর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর জিপ লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করে। এতে গাড়িখানা অকেজো হয়ে পড়ে যায়। ফলে পাকসেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের উপর এলোপাতাড়ি গুলি চালালে মুক্তিসেনারাও পাল্টা গুলি চালাতে থাকে। একপর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা সাঁকোর পার্শ্ববর্তী ধানক্ষেতে নিরাপদে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তাদের গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাকসেনারা দ্রুত খাল পার হয়ে ধানক্ষেত ঘিরে ফেলে মোঃ ইসমাইল নামে ২ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে ফেলে ও সাথে সাথেই গুলি করে তাদের হত্যা করে। এছাড়া জয়নারায়নপুরে আব্দুল হাই পাটওয়ারী, ডা. সুলতান আহম্মদ, আনসার আলী ও এবাদ উল্লাহকে গুলি করে হত্যা করে এবং উক্ত গ্রামের ১৯টি বাড়ি সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয়। তারপর সিএন্ডবি পুলের পশ্চিম দিকে আমিন বাজারসহ মিয়াপুরের তিনটি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।[৯] ২৪ এপ্রিল ফেনাঘাট অপারেশন শেষে পাকবাহিনী চন্দ্রগঞ্জ পূর্ব বাজার সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয় এবং জগদীশপুর গ্রামের দুইটি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। উপরন্তু গ্রামের তেলী বাড়ির দু'জন নিরীহ লোককে গুলি করে হত্যা করে। তাদের একজনের নাম সুজা মিয়া এবং অন্য জনের নাম জানা যায়নি।[১০]

চিত্র-৫৫: ফেনাঘাটার যুদ্ধ ও গণহত্যাস্থল-চিত্রে স্মৃতিময় স্থানটি নির্দেশ করছেন মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল কবির।

হাতিয়ায় আক্রমণ, সংঘর্ষ ও গণহত্যা (৯ মে ১৯৭১)

হাতিয়া নোয়াখালী জেলার একটি উপজেলা। একাত্তরের ৯ মে সন্ধ্যায় প্রায় ৫০০ জন পাকসেনা নৌকা যোগে হাতিয়ায় পৌঁছে। কমান্ডার মোসলেহ উদ্দিনের নেতৃত্বে মোঃ রফিক, আমিন হোসেন মাস্টার, দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ওয়ালিউল্লাহ, রহমত উল্লাহ ও মেহেরাজ প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধাগণ প্রাথমিকভাবে রাইফেল দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাকসেনাদের সংখ্যা অধিক হওয়ায় এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকায় মুক্তিযোদ্ধাগণ তাদের সামনে

টিকতে না পেরে নিরাপদে আশ্রয় নেন। কিছুক্ষণ পরেই পাকসেনারা তিনটি গ্রুপে ভাগ হয়ে হাতিয়া অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং ঐ দিনই দাসপাড়া, মহানন্দী ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ঢুকে নারী-পুরুষদের উপর নির্যাতন চালায় এবং অনেক নিরীহ মানুষ গণহত্যার শিকার হয়। এমনকি বেশ কয়েকজন নারীকে ধর্ষণ করে। পরের দিন সকাল ৮টায় পাকসেনারা মাওলানা আব্দুল হাইয়ের বাড়িতে ঢুকে নারী-পুরুষের উপর ব্যাপক নির্যাতন করে এবং উক্ত বাড়ি থেকে বের হয়ে ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের বাড়ি, তালুক মিয়া বাড়ি, প্রকাশের বাড়ি, সুবল ডাক্তারের বাড়ি ও আফাজিয়া বাড়িসহ প্রায় ১০০ টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর পাকসেনারা আফাজিয়া বাজারে গিয়ে ৬ জনকে হত্যা করে এবং পরে ওচখালী বাজারে ঢুকে বাজারটি আগুন দিয়ে পুরোপুরি পুড়িয়ে দেয়। অবস্থা বুঝে পরের দিন পাকসেনারা হাতিয়া ত্যাগ করে। হাতিয়া উপজেলাটি দ্বীপাঞ্চল হওয়ায় পাকবাহিনী আর কখনো সে এলাকায় যায়নি।[১১]

চিত্র-৬৩: হাতিয়ার আক্রমণ ও গণহত্যার স্থল-এই গ্রামে আক্রমণ ও গণহত্যা সংঘটিত হয়।

কোম্পানীগঞ্জে গণহত্যা ও নির্যাতন (মে মাসের মধ্যভাগ ১৯৭১)

নোয়াখালী সদর থেকে কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ আনুমানিক ১৫/১৬ তারিখে পাকবাহিনী কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় প্রবেশ করে। প্রায় এক হাজার জন পাকসেনা গাড়ির বহর নিয়ে ফেনীর দাগনভূঁঞা দিয়ে কোম্পানীগঞ্জে ঢুকে পড়ে। পাকসেনাদের সঙ্গে গাড়িতে আলম মিয়া, রহমত উল্লাহ ও মৌলভী শফি ছিলেন। তাদের স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসেন শান্তি কমিটির নেতা তৎকালীন নেজামে ইসলামের লোক হাকিম ইলিম, মুসলিম লীগের মাওলানা জয়নাল ও জামায়েত ইসলামীর এরফান মিয়া। কোম্পানীগঞ্জে ঢুকেই পাকসেনারা বিভিন্ন বাড়িতে গণহত্যা ও নির্যাতন চালায়। বড় রাজপুরের নির্মল মাস্টার, মিরাজপুরের শর্মাবালা কর্মকার, কৈলাশ চন্দ্র কর্মকার, বিরাহীমপুরের হরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী ও সিরাজপুরের বদুমুন্সী প্রমুখ গণহত্যার শিকার হয়। এছাড়া পাকসেনারা ননী গোপাল গোস্বামী, মানাসিং, নগেন ডাক্তার ও পণ্ডিতবাড়ি লুটপাট করে এবং খেলু চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে দুই মেয়েকে তুলে নিয়ে যায়। এসব গণহত্যা ও নির্যাতন চালিয়ে পাকসেনারা কোম্পানীগঞ্জ ত্যাগ করে।[১২]

চিত্র-৬৭: কোম্পানীগঞ্জের গণহত্যাস্থল- চিত্রে মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবু নাসের বধ্যভূমিটি দেখাচ্ছেন।

সোনাপুর ও শ্রীপুরে গণহত্যা ও নির্যাতন (১৫ জুন ১৯৭১)

নোয়াখালী পৌরসভার দক্ষিণে সোনাপুর অবস্থিত। এর চারপাশে শ্রীপুর, মহব্বতপুর, করিমপুর ও গোপাই গ্রাম অবস্থিত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মহান মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী জেলায় যতগুলো হত্যাকাণ্ড, গণহত্যা ও নির্যাতন হয়েছিল তারমধ্যে সোনাপুর ও শ্রীপুর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন দুপুর ২টার দিকে গ্রামের মানুষ যখন বিশ্রাম নিচ্ছে ঠিক সেই সময় পাকবাহিনী দুই-তিন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সোনাপুর, শ্রীপুর ও করিমপুরে ঢুকে পড়ে এবং তাদের সহযোগিতা করে স্থানীয় রাজাকার ও শান্তিকমিটির নেতারা। পাকসেনারা এসব গ্রামে ঢুকেই এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। এসব গোলাগুলির শব্দে গ্রামের মানুষজন নারী-পুরুষ জীবন বাঁচাতে দিক-বিদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। ততক্ষণে পুরো এলাকা পাকহানাদার বাহিনী ঘিরে ফেলে। এ ঘটনার কিছুদিন আগে মাহমুদুর রহমান বেলায়েতের নেতৃত্বে মুক্তিকামী মানুষ পাকবাহিনীর নোয়াখালী অস্ত্রাগার লুট করে সোনাপুর এলাকা দিয়ে পূর্বাঞ্চলে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ পাকবাহিনী এলাকায় ঢুকেই প্রথমে আহম্মদিয়া বিদ্যালয়ের সামনে আলী হোসেনকে গুলি করে হত্যা করে। তারপর বিদ্যালয়ের পিছনে তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁর ভাই আলী করিম, আলী হায়দার ও এক অতিথিকে গুলি করে হত্যা করে।[১৩] তার বৃদ্ধা পিতাকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। অতঃপর লুটতরাজ করে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সোনাপুরের হোমিও ডাক্তার আবু ফররার, তার মা ও দুই মাসের শিশুকে গুলি করে হত্যা করে। সোনাপুর, শ্রীপুর ও করিমপুর গ্রামে ঢুকে পাকসেনারা বাড়ি-ঘর, দোকান-পাটে আগুন ধরিয়ে দেয়। পাকবাহিনীর নির্মম আক্রমণে নির্যাতিত হন পনেরেরও অধিক নারী। পাকবাহিনীর এই তাণ্ডবলীলা প্রায় ৩০ মিনিট স্থায়ী ছিল। গণহত্যার শিকার হন প্রায় ১১৮ জন মুক্তিকামী মানুষ। এই গণহত্যায় তোতামিয়া, আব্দুল গফুর, আবুল কাশেম, আব্দুল কাইয়ুম, বাচ্চুমিয়া ও যোশেফ সোয়ারিশ প্রমুখ প্রাণ দিয়েছেন।[১৪] সোনাপুর ও শ্রীপুরের গণহত্যা ও নির্যাতন পাকবাহিনীর বর্বরতম কর্মকাণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। পাকবাহিনীর এইরূপ ঘৃণ্য ও বর্বরচিত হত্যাকাণ্ডের কারণে নোয়াখালী জেলার জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের চেতনা আরও ব্যাপকভাবে জাগ্রত হতে থাকে এবং তারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনি।

চিত্র-৭২: শ্রীপুর বধ্যভূমি- চিত্রে বধ্যভূমিটি চিহ্নিত করছেন মুক্তিযোদ্ধা শামছু মিয়া।

চিত্র-৭৩: সোনাপুর বধ্যভূমি- চিত্রে বধ্যভূমিটি দেখাচ্ছেন শহিদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সাংবাদিক মোঃ রুনু।

সেনবাগে অগ্নিকাণ্ড, গণহত্যা ও নির্যাতন (১৫ আগস্ট ১৯৭১)

নোয়াখালী সদর থেকে উত্তরপূর্ব দিকে সেনবাগ উপজেলা অবস্থিত। সেনবাগ উপজেলার সেনবাগ থানা ছিল মিলিশিয়া ও পাকবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি। এখান থেকে পাকবাহিনীর সদস্যরা সেনবাগ

উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চল ও গ্রামে অপারেশন পরিচালনা করত। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা এই ক্যাম্পটি আক্রমণের পরিকল্পনা মোতাবেক করেন।

চিত্র-৮৮: সেনবাগ থানা- চিত্রে আক্রমণস্থল নির্দেশ করছেন মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ আবু তাহের।

গ্রুপ কমান্ডার মোহাম্মদ আলী ও গ্রুপ কমান্ডার জয়নালের নেতৃত্বে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট পাকবাহিনীর ক্যাম্পটি আক্রমণ করেন। কিন্তু পাকসেনাদের ভারী অস্ত্রের মুখে মুক্তিযোদ্ধারা সুবিধা করতে না পেরে নিরাপদ স্থানে চলে যান। এতে কয়েকজন পাকবাহিনীর কয়েকজন সদস্য আহত হওয়ায় এই আক্রমণের প্রতিশোধস্বরূপ পাকসেনারা ১৫ ও ১৬ আগস্ট সেনবাগ থানার আশেপাশের মুক্তিযোদ্ধাদের আটটি বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগসহ চারিন্দ্রোন গ্রামের মোঃ ইলিয়াছকে গুলি করে হত্যা করে এবং বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ নির্যাতনের শিকার হন।[১৫]

গোপালপুরে গণহত্যা ও নির্যাতন (১৯ আগস্ট ১৯৭১)

১৯৭১ সালের ১৯ আগস্ট সকাল আটটার দিকে কয়েকশ পাকসেনা ও রাজাকার একত্রে বেগমগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর সড়কের কাছে শামসুন্নাহার হাই স্কুলে এসে অবস্থান নেয়। তারা ১০ আগস্টের বিপর্যয়ের প্রতিশোধ নিতে ১৯ আগস্ট গোপালপুরে আক্রমণ চালায়। পাকসেনারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে রাজাকারসহ একটি দল গোপালপুর বাজারের পশ্চিম দিক দিয়ে এবং বাকিরা মূল রাস্তা দিয়ে চারদিক থেকে বাজার ঘিরে ফেলে। সকাল আটটার দিকেই এই অপারেশন পরিচালিত হয়। এই সময় মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ও চেয়ারম্যান মাহবুবুল হায়দার চৌধুরী (নসা মিয়া) গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ ঠেকানোর পরিকল্পনা করে পাকসেনাদের কাছে নিজের পরিচয় দেন। কিন্তু পাকসেনারা তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য করে নসা মিয়াসহ অর্ধশতাধিক নিরীহ গ্রামবাসী ও দোকানদারদের উপর নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন চালায়। কিছুলোক দৌড়ে জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু পাকসেনারা প্রায় ৫০ জন গ্রামবাসীকে ধরে গোপালপুর বাজারের পূর্ব পাশে ছোট্টখাল পাড়ে নিয়ে যায় এবং মাত্র পাঁচজনকে ছেড়ে দিয়ে নসা মিয়াসহ ৪৫ জনকে লাইনে দাঁড়

করে ব্রাশফায়ার মাধ্যমে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।[১৬] কিছুলোক দৌঁড়ে জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু পাকসেনারা প্রায় ৫০ জন গ্রামবাসীকে ধরে গোপালপুর বাজারের পূর্ব পাশে ছোট্টখাল পাড়ে নিয়ে যায় এবং মাত্র পাঁচজনকে ছেড়ে দিয়ে নসা মিয়াসহ ৪৫ জনকে লাইনে দাঁড় করে ব্রাশফায়ার মাধ্যমে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। শুধু গণহত্যাই নয় পাকসেনারা চার-পাঁচ জন নারীকেও ধর্ষণ করে এবং আধঘণ্টার মধ্যে তারা হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে গোপালপুর বাজার ত্যাগ করে। এই হত্যাযজ্ঞে শহিদ হলেন- মাহবুবুল হায়দার চৌধুরী (নসা মিয়া), দীন মুহাম্মদ, ইসমাইল মিয়া, মোহাম্মদ উল্লাহ, হাবিব উল্লাহ, দুলাল মিয়া, শামসুল হক মাস্টার, বসির উল্লাহ, হারিস মিয়া, মমিন উল্লাহ, আব্দুস সাত্তার, আব্দুর রশিদ, নূর মোহাম্মদ, আবদুল মান্নান ও আবুল কাশেমসহ পঁয়তাল্লিশ জন।[১৭]

চিত্র-৮৯: গোপালপুর গণকবর- চিত্র নির্দেশক মুক্তিযোদ্ধা লকিয়ত উল্যাহ।

রামহরি তালুকে গণহত্যা (৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

নোয়াখালী সদর থেকে দক্ষিণে পাঁচ কিলোমিটাপর দূরে রামহরি তালুক নামক স্থানটি অবস্থিত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৯ টার দিকে পাকবাহিনী নোয়াখালী সদর উপজেলার রামহরিতালুক গ্রাম ঘেরাও করে এবং গুলি করে বহু লোককে হত্যা করে। এই হত্যাযজ্ঞে মমিন উল্যাহ, নুরুদ্দিন, সাহাব উদ্দিন, আনা মিয়া, সফিক উল্যাহ, হেঞ্জু মিয়া, ছেরাজুল হক, রমজান আলী ও জুলফিকার আলীসহ আরও অনেকে শাহাদত বরণ করেন। ৩ সেপ্টেম্বর পাকবাহিনী রামহরিতালুক যাওয়ার পথে দেবীপুর পুলের উপর আলী নামক একজনকে গুলি করে হত্যা করে এবং ছাদু মাঝির বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ঘটায় এবং ছাদু মাঝিকে হত্যা করে।[১৮]

চিত্র-৯৩: রামহরি তালুকের গণহত্যাস্থল- চিত্রে স্মৃতিময় স্থানটি দেখাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম কিবরিয়া লাতু।

১৫নং স্লুইস গেট অপারেশন ও গণহত্যা (৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ১৫ নং স্লুইস গেটের পাশে রাজাকার ক্যাম্প অবস্থিত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর আব্দুর রাজ্জাক ও খিজির হায়াতের নেতৃতে মুক্তিযোদ্ধারা ১৫নং স্লুইস গেটে রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করেন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা আগের আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে রাজাকাররা এ্যাম্বুশ ফিট করে রাখে তা মুক্তিযোদ্ধারা জানতো না। ফলে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি অজান্তে সেই এ্যাম্বুশের মুখে পড়ে যায় এবং হঠাৎ আক্রমণের কারণে মুক্তিযোদ্ধা ছালেহ আহাম্মদ মজুমদার, ফারুক, ইসমাইল, আব্দুর রব বাবু, আখতারুজ্জামান ও মোস্তফা কামাল ভুলু মোট ছয়জন শহিদ হন এবং মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম ও আবু নাসের আহত হন।[১৯]

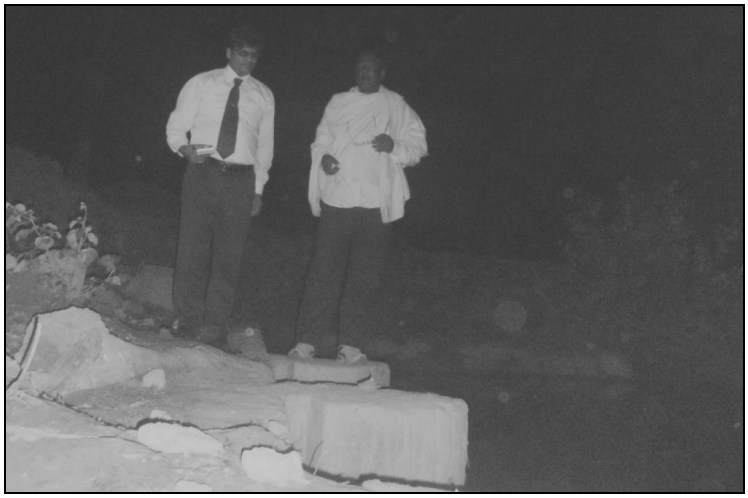

চিত্র-৯৪: ১৫নং স্লুইস গেটের আক্রমণস্থল- চিত্রে স্থানটি দেখাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবু নাসের।

দমদমা দিঘির পাড়ের গণহত্যা (২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নোয়াখালী জেলায় পাকসেনারা প্রবেশ করার পর থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলে গণহত্যা ও নির্যাতন চালাতে থাকে। এর মধ্যে বেগমগঞ্জের দমদমা দিঘির পাড়ের গণহত্যা ছিল অন্যতম। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর পাকবাহিনী বিজয়নগর এলাকায় ঢুকে সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন চালায় এবং প্রত্যক্ষদর্শী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মতে, ৩০/৪০ জনকে ধরে এনে দমদমা দিঘির পাড়ে হত্যা করে।[২০] এদের মধ্যে শামছুল হক, হায়দার আলী, মোহাম্মদ উল্যা, বাচ্চু মিয়া, মোঃ আব্দুল আলী, আব্দুল বারেক ও ছোলাইমান প্রমুখ গণহত্যার শিকার হন।[২১]

চিত্র-৯৮: দমদমা দিঘির পাড় গণহত্যাস্থল- চিত্রে মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল কবির গণহত্যার স্থানটি চিহ্নিত করছেন।

রাজগঞ্জ অপারেশন ও গণহত্যা (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

পাকবাহিনীকে আক্রমণের জন্য ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর 'সি' জোনের মুক্তিযোদ্ধাদের ছয়টি দল বেগমগঞ্জ থানার রাজগঞ্জের চতুর্দিকে অবস্থান নেয়। রাজগঞ্জ বাজার থেকে মাইজদীতে অবস্থানরত পাকসেনাদেরকে এই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রস্তুতি অব্যাহত থাকলেও অন্য অপারেশনের জন্য পাঁচটি দল প্রত্যাহার করে ঐদিন রাত ১১ টায় জরুরি প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়। পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের এই প্রত্যাহারের সংবাদ পেয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে তিনটার (অর্থাৎ ২৭ সেপ্টেম্বর) দিকে চারদিক থেকে আক্রমণ করে। তাদের প্রধান দলটি মাইজদী বাজার থেকে ছয়ানি রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হয়ে নোয়াখালী কলেজ (পুরাতন) সংলগ্ন এলাকা থেকে ২ ইঞ্চি মর্টারগান দিয়ে গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে এবং বাকি চারটি দলও বিভিন্ন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বৃষ্টির মত গোলাবর্ষণ শুরু করে। এদিকে কমান্ডার হাবিলদার হাসেমের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা দৃঢ়তার সাথে পাকবাহিনীকে মোকাবেলা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ছয়ানি থেকে একটি দল কমান্ডার হাসেমের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে। মুক্তিযোদ্ধা হাসেম ও তাঁর দল ২৭ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে পাকবাহিনীর ২৩ জন সৈন্যকে হত্যা করে।[২২]

সম্মুখ যুদ্ধের ভয়াবহতার কারণে হাসেমের সাহায্যকারীরা যথাসময়ে গোলাবারুদ সরবরাহ করতে না পারায় হাসেমের বাহিনীর গোলাবারুদ শেষ হয়ে যায়। এর পরও কমান্ডার হাসেম যুদ্ধস্থলে ৩০ মিনিট অবস্থান করেন। কিন্তু পাকসেনারা বিষয়টি অনুধাবন করে চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করে।[২৩] অন্যদিকে সবুজ, রবি, গোলাম হায়দার এবং সফিকুর রহমানকে ধরে ফেলে পাকসেনারা প্রথমে গোলাম হায়দারকে হত্যা করে এবং বাকিদেরকে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে আসে। একই জায়গা থেকে ছয়জন নিরস্ত্র বাঙালিকেও তারা ধরে নিয়ে আসে। সবুজ, রবি ও সফিকুর রহমানের সাথে এ ছয়জনকেও হত্যা করে মাইজদী জেনারেল হাসপাতাল ভবনের পিছন পাশের পূর্ব-উত্তর কোণে বিল্ডিং এর পেছনে গণকবর দেয়।[২৪] একই তারিখে পাকসেনারা নগেন্দ্র সুর উকিল (রায় বাহাদুর) ও মানিক লাল চৌধুরীসহ আরও ১৩ জনকে ধরে নিয়ে আসে এবং গুলি করে হত্যা করে গণকবর দেয়।[২৫]

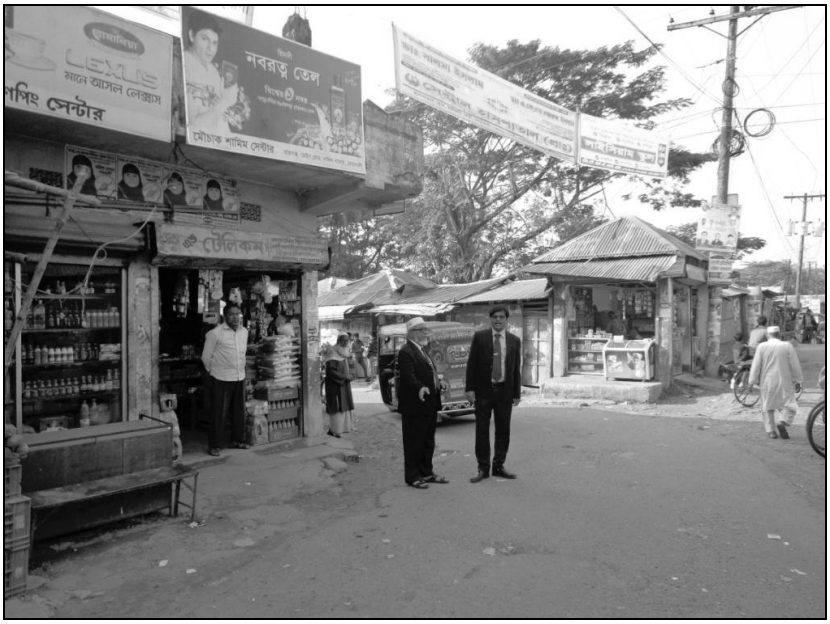

চিত্র-৯৯: রাজগঞ্জের অপারেশন ও গণহত্যার স্থল- ঘটনার স্থানটি নির্দেশ করছেন মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল কবির।

গুরুত্ব ও ফলাফল

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া বর্বরোচিত গণহত্যা ও নিযার্তন বাংলাদেশের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সমগ্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা নিয়ে অনেক লেখক ও গবেষক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন কিন্তু আঞ্চলিক মুক্তিযুদ্ধ ও নির্যাতন-গণহত্যা নিয়ে তেমন কোন গবেষণা হয়নি বললে চলে। ফলে আঞ্চলিক গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে নোয়াখালী জেলার গণহত্যা ও নির্যাতনের ঘটনাবলি খুবই গুরুত্ব বহন করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বালাদেশের ন্যায় নোয়াখালী জেলায়ও মুক্তিকামী জনগণ অংশ নিয়েছিল কিন্তু পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীরা অত্র অঞ্চলের নিরীহ জনগোষ্ঠী এবং মুক্তিকামী জনগণের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা চালায় যা আলোচ্য প্রবন্ধে সুন্দর ও নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সরজমিনে জরিপ, মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার, গণকবরের স্থান নির্ণয়সহ প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে

আলোচ্য প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করায় এই গবেষণাকর্মটির গুরুত্ব খুবই বেশি। শুধু তাই নয় উক্ত গবেষণাকর্মটি নির্ভুলভাবে রচিত হয়েছে, এমনকি তথ্যনির্ভর ও সঠিকভাবে রচিত হওয়ায় পাঠকগণ একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানতে পারবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানাতে সহয়াতা করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশে যে ধরনের গণহত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে কোন কোন ক্ষেত্রে তা অতিক্রম করেছিল। স্বাধীনতা বিরোধী পাকবাহিনী ও তার সহযোগীরা নোয়াখালী জেলায় মুক্তিকামী ও নিরীহ জনগণের উপর যে বিভিষীকাময় তান্ডবলীলা চালিয়েছিল তা প্রবন্ধটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের আক্রমণ থেকে এ অঞ্চলের নারীরাও রক্ষা পায়নি। তারা নারীদের উপর অমানষিক অত্যাচার-নির্যাতন করেছিল। এমনকি অনেক নারীকে ধর্ষণও করেছিল যা অত্র গবেষণার মাধ্যমে জানা যায়। তারা অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার ও নিরীহ মানুষের বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ করেছিল। তারা এই জেলার মুক্তিকামী জনগণের উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পুরো এলাকায় গণহত্যা চালিয়েছিল। কিন্তু সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতন, অগ্নিকান্ড এবং গণহত্যার পরও নোয়াখালী জেলার মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী পাকবাহিনীকে মোকাবেলা করে এবং শত্রুপক্ষকে পরাজিত বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর নোয়াখালী স্বাধীন হয়েছিল। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া সেই হৃদয় বিদারক স্মৃতিগুলো এবং স্মৃতি বিজোড়িত স্থানসমূহ এখনও নোয়াখালী জেলার মানুষদেরকে স্তম্ভিত করে তোলে। অত্র জেলার এসব স্মৃতি স্থানসমূহ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পঠন-পাঠনে ও গবেষণা ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও লেখকদের অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বৃহত্তর গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ খালেদ মাসুকে রসুল, *নোয়াখালীর লোকসাহিত্যে লোক জীবনের পরিচয়*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯২, পৃ. ০৫

২ মোহাম্মদ আমীন, *জেলা, উপজেলা ও নদ নদীর নামকরণের ইতিহাস*, ঢাকা: গতিধারা প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ১৩২

৩ এ. কে. এম. গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ, *নোয়াখালীর লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ইতিহাসের উপাদান*, টাঙ্গাইল: ছায়ানীড়, ২০১৪, পৃ. ২৪

৪ কাজী মোজাম্মেল হক, *তিন হাজার বছরের নোয়াখালী*, ফেনী: হিরামন প্রকাশনালয়, নোয়াখালী, ১৯৮২, পৃ. ৩৮

৫ Jafor Ahmad Khan (ed.), *District Statistics: Greater Noakhali*, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 2013, p. 03.

৬ *তদেব*, পৃ. ০৩

৭ মোঃ ফখরুল ইসলাম, *নোয়াখালীর ইতিহাস*, আঞ্জুমান আরা বেগম, মাইজদী: নোয়াখালী, ১৯৯৮, পৃ. ০১

৮ কারী করিম উল্যা ও মোঃ মোশাররফ হোসেন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী 'সি' জোন*, নোয়াখালী: লাকী অফসেট প্রেস, ১৯৯৮, পৃ. ১০

৯ জোবাইদা নাসরীন, *মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৬৫

১০ কারী করিম উল্যা ও মোঃ মোশাররফ হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

১১ এ. কে. এম গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ, *মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী*, ঢাকা: গতিধারা প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ৮৭-৮৮

১২ জোবাইদা নাসরীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬

১৩ সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা মো. শামছু মিয়া, উপজেলা-সোনাপুর, জেলা- নোয়াখালী, তারিখ - ১৭.১২.২০১৬

১৪ এ. কে. এম গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ, *মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

১৫ সাক্ষাৎকার: বীর মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ আবু তাহের, পিতা- মৃত নাজির আহমদ, গ্রাম- শুভপুর, ইউনিয়ন- কাদরা, উপজেলা- সেনবাগ, জেলা- নোয়াখালী, তারিখ-২০.১২.২০১৬

১৬ জোবাইদা নাসরীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬-১১৭

১৭ সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা লকিয়ত উল্যাহ, পি- মৃত আমিন উল্যাহ, গ্রাম-শধুপুর, উপজেলা-বেগমগঞ্জ, জেলা- নোয়াখালী, তারিখ-১৭.১২. ২০১৬; কারী করিম উল্যা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

১৮ কারী করিম উল্যাহ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪-২৫

১৯ এ. কে. এম গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯১

২০ সাক্ষাৎকার: বীর মুক্তিযোদ্ধা এড. ফজলুল কবির, পিতা- মৃত মোঃ রুহুল আমিন, গ্রাম- বারই চতল, ইউনিয়ন- ৩ নং জিরতলী, উপজেলা-বেগমগঞ্জ, জেলা- লক্ষ্মীপুর, তারিখ- ১৭.১২.২০১৬

২১ সাক্ষাৎকার: বীরমুক্তিযোদ্ধা ডা. লোকমান, পিতা-মৃত এমতাজ আলী, গ্রাম-বিজয়নগর, ইউনিয়ন-৩নং জিরতলী, উপজেলা- বেগমগঞ্জ, জেলা- নোয়াখালী, তারিখ-১৭.১২.২০১৬

২২ কারী করিম উল্যা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

২৩ *তদেব*, পৃ. ২৭

২৪ জোবাইদা নাসরীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩

২৫ কারী করিম উল্যা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, ৯ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪